ভারতীয়ই বাণিজ্যের সূত্রে বিদেশে গিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে থাকে। এভাবেই বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকে।

তখন প্রধানত তাম্রলিপ্তি বন্দরের মাধ্যমেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলত। অন্যদিকে ক্যান্টিন বন্দরের মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য চলত। পাশ্চাত্যের সঙ্গে এ সময় বাণিজ্য ব্যাহত হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসারে সে ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ৪. ইলতুৎমিস কীভাবে দিল্লির সুলতানী শাসনকে সংহত এবং প্রসারিত করেন?

উত্তর :— সুলতান ইলতুৎমিস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ডঃ আর.পি. ত্রিপাঠী বলেছেন যে তাঁর শাসনকাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা হয়।

ইলতুৎমিসের রাজত্বের সূচনা হয় নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে। প্রথমত গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইলদুজ এবং মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন কুবাচা তাঁকে স্বীকার করে নিতে রাজি ছিলেন না। দ্বিতীয়ত সুলতানের সঙ্গে তুর্কী আমীর-ওমরাহদের সাংবিধানিক সম্পর্ক স্থির করা জরুরি হয়ে ওঠে। কেননা এরা নিজেদের সুলতানের সমকক্ষ বলেই মনে করত। ফলে সুলতানের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হত। তৃতীয়ত বাংলা পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। চতুর্থত চারিদিকে নানা সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে রাজপুতগণ নিজেদের লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হয়। সর্বোপরি ভয়ঙ্কর রক্তলোলুপ চেঙ্গিজ খাঁর ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রথমেই ইলতুৎমিস গজনীর দিকে দৃষ্টি দেন। এই সময় খারজম শাহের আক্রমণে তাজউদ্দিন গজনী হারিয়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় নেন এবং লাহোর অধিকার করেন। তদুপরি তিনি ইলতুৎমিসের বশ্যতা দাবি করলেও ইলতুৎমিস তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে তাজউদ্দিন পরাজিত এবং নিহত হন। দিল্লির উপর গজনীর দাবি এই পরাজয়ের ফলে চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

এদিকে নাসিরুউদ্দিন পাঞ্জাব পর্যন্ত অগ্রসর হলে ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস তাঁকেও যুদ্ধে পরাজিত করেন।

এই সময়ই পাঞ্জাব মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে ওঠে। কারণ মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খাঁ খারজম রাজ্য আক্রমণ করলে খারজম শাহ জালালউদ্দিন পাঞ্জাবে পালিয়ে আসেন এবং ইলতুৎমিসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু

ইলতুৎমিস যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে এই বিরোধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন। ফলে জালালউদ্দিন পারস্যে পালিয়ে যান। সেই সঙ্গে চেঙ্গিস খাঁও তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করেন। এইভাবে নবজাত সুলতানী শাসন এক ভয়াবহ আক্রমণকারীর হুঙ্কার থেকে অব্যাহতি পায়।

এরপর ইলতুৎমিস নাসিরউদ্দিনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন। বাংলার বিদ্রোহও তিনি দমন করেন। তাছাড়া তিনি রণথমভোর, গোয়ালিয়র, কনৌজ এবং কালিঞ্জর পুনরায় দখল করে সুলতানী সাম্রাজ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে যে স্বীকৃতি লাভ করেন তার ফলে রাজপথে তাঁর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ মুসলমান জগতে খলিফার স্বীকৃতিই ছিল শেষ কথা।

শুধু সাম্রাজ্যের সঙ্কট দূরীকরণের ক্ষেত্রেই নয়, সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তিনি এক কেন্দ্রীক শাসন গড়ে তোলেন। তিনি যে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন তার শক্তির উৎস ছিল মূলত বিদেশিদের নিয়ে গঠিত এক সর্বভারতীয় সামরিক ও প্রশাসনিক সংগঠন। তিনি ইকতা বা প্রাদেশিক প্রশাসন, সামরিক বাহিনীর সংগঠন গড়ে তোলেন। রাজধানী হিসাবে তিনি দিল্লিকে মর্যাদামণ্ডিত করতে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। কুতুবমিনারের নির্মাণকার্যও তিনি সম্পন্ন করেন। সেই সঙ্গে তিনি দিল্লিকে জ্ঞানচর্চার এক কেন্দ্রে পরিণত করেন।

এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে ইলতুৎমিস নবজাত সুলতানী সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর সুগভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং কূটনৈতিক জ্ঞান তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাছাড়া এতকাল ভারতে তুর্কী শাসনের ভিত্তি ছিল ঘুর সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য। কিন্তু ইলতুৎমিস এই প্রভাব থেকে দিল্লিকে মুক্ত করেন। তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ডঃ নিজামী ঠিকই বলেছেন, ইলতুৎমিস দেশকে দিয়েছেন এক রাজধানী, একটি স্বাধীন রাজ্য, শক্তিশালী রাজতন্ত্র এবং এক শাসক সম্প্রদায়। সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে তিনি তাঁর কন্যা রিজিয়াকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

প্রশ্ন ৫. কুতুবউদ্দিন আইবক কীভাবে দিল্লিতে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : মহাম্মদ ঘুরীর এক ক্রীতদাস নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ঘুরীর অন্যতম সেনাপতির পদে উন্নীত হন। সেই ক্রীতদাস হলেন কুতুবউদ্দিন আইবক।

Scanned with OKEN Scanner

ক্ষমতা হস্তগত করা যায়।

বিপ্লব প্রমাণ করে দেয় যে পেশীশক্তিই সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। খিলজী রাজবংশও ছিল সামরিক শক্তিনির্ভর। শুধু তাই নয়, তারা বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে অনুমোদন পেতে কোনো আগ্রহও প্রকাশ করেনি।

খিলজী বিপ্লবের অন্যান্য প্রতিক্রিয়া হল : এই বংশেরই আলাউদ্দিন সুলতানী শাসনকে এক সর্বভারতীয় রূপ দিয়েছিলেন, তুর্কী অভিজাতদের তুলনায় খিলজীগণ ছিল অনেক উদার, খিলজী রাজবংশ শাসনব্যবস্থাকে রক্ষণশীল উলেমা শ্রেণির প্রভাব থেকে মুক্ত করে, এই রাজবংশই বহু প্রগতিশীল সংস্কারসূচী গ্রহণ করে এবং তারা ভারতের সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে খিলজী বিপ্লবের মধ্য দিয়েই দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা, স্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

♦ প্রশ্ন ১০. আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।

উত্তর : "শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা" :— আলাউদ্দিন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে তোলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি অনেক মন্ত্রী নিয়োগ করেন ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস।

সুলতানের প্রধান সহকারীকে বলা হত উজীর। কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হত। তিনি আবার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও করতেন। প্রয়োজনে যুদ্ধেও যোগ দেন। উজীরের পর ছিলেন দেওয়ান-ই-আশারফ। ইনি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের এবং রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সামরিক বিভাগের প্রধানকে বলা হত আরিজ-ই-মামালিক। কৃষি বিভাগের প্রধান ছিলেন আমীর-ই-কোহি। কিন্তু সামরিক কিংবা বেসামরিক বিভাগের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না।

সুশাসনের স্বার্থে আলাউদ্দিন তাঁর সাম্রাজ্যকে উনিশটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রতিটি প্রদেশে থাকত একজন শাসনকর্তা। এই শাসনকর্তাদের নিয়োগ করতেন সুলতান। যতদিন শাসনকর্তাগণ সুলতানের আস্থাভাজন থাকতেন, ততদিন তারা ক্ষমতায় থাকতে পারতেন। তাদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখত এক গুপ্তচর বাহিনী।

"অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" :— আলাউদ্দিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব ব্যবস্থা

নিয়েছিলেন তার মধ্যে আগে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলতে হয়।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এবং সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখতে আলাউদ্দিনের ছিল এক বিশাল সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী তিনি নগদ অর্থে বেতন দানের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং তাঁর প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের। তা ছাড়া জনগণের হাতে সঞ্চিত অতিরিক্ত অর্থ বের করতেও তিনি রাজস্ব ব্যবস্থাকে নিয়োগ করেন।

প্রথমে তিনি দেবোত্তর জায়গীর এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি জমিদার ও রায়তদের জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন। হিন্দুগণ যেন বিলাসী জীবনযাপন করতে না পারে সেইজন্য তিনি তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। তখন প্রচলিত ছিল ভূমি রাজস্ব, চারণ কর, গৃহ কর, করহি নামে সম্ভবত এক বাণিজ্য কর, সেচ কর ইত্যাদি। ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের জন্য তিনি জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ ছিল ভূমি রাজস্বের হার।

এই রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বলেছেন যে আলাউদ্দিন তাঁর রাজস্ব নীতির সাহায্যে প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ তখন কৃষককে সব ধরনের কর মিলিয়ে উৎপন্ন ফসলের ৭৫ থেকে ৮৫ শতাংশ কর দিতে হত। তা হলে এমন ব্যবস্থাকে কৃষক স্বার্থ রক্ষাকারী বলে বর্ণনা করা যায় না। তাই ঐতিহাসিক ডঃ লাল বলেছেন, আলাউদ্দিনের লক্ষ্য ধনী জমিদারদের দমন করা হলেও তাঁর আইনগুলি দরিদ্রদের পক্ষে কম ক্ষতিকারক ছিল না।

আলাউদ্দিনের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী হল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ। এ কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন কেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মতপ্রকাশ করেছেন। একটি মত হল সৈন্যবাহিনীর জন্য বর্ধিত ব্যয়ভার ছাড়াও সেই সময় প্রশাসনিক ব্যয়ও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পায়। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পেতেই আলাউদ্দিন মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার মতো এক সাহসী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। অন্য একটি মত হল, জনকল্যাণের মহান কর্তব্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই আলাউদ্দিন মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করতে উৎসাহিত হন।

ঐতিহাসিক বারাউনী এই নীতির একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তা হল, পণ্য সামগ্রীর মূল্য-সূচক স্থিতিশীল রাখা একটি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। বিশেষ করে

Scanned with OKEN Scanner

হয়েছিল। গ্রামের হিসাব পরীক্ষকের পদ ছিল পুরুষানুক্রমিক। তাছাড়া ছিল পাহারাদার এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবস্থাপক। গ্রামের কর্মচারীদের হয় জমি দান করা হত অথবা উৎপাদিত শস্যের একাংশ দেওয়া হত। মধ্য নায়কাচার্য গ্রামের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক রক্ষা করত। গ্রামের প্রধানেরা সাধারণ অপরাধের বিচার করত।

বিদেশি পর্যটকেরা বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শাসন কখনো অত্যাচারী ছিল না। অক্ষুণ্ণ ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধি। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থা সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না।

বলা হয়, রাজাকেন্দ্রিক শাসন হওয়ায় রাজার কর্মক্ষমতার উপর শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করত। দ্বিতীয়ত সমগ্র শাসনব্যবস্থায় ছিল ব্যাপক দুর্নীতি। রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিল লোভী। তৃতীয়ত রাজসভার জন্য ব্যয় হত অকাতরে। শাসকগোষ্ঠীগণ চরম বিলাসিতায় জীবন কাটাত। সব কিছুর জন্যই সবাইকে কর দিতে হত। চতুর্থত পণ্ডিতেরা বলেন যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজসাধ্য ছিল না। রাষ্ট্রের এই সামন্ততান্ত্রিক গঠনই বিজয়নগরের পতনের অন্যতম কারণ। পঞ্চমত বিজয়নগর পর্তুগীজদের আগ্রাসী এবং স্বার্থান্বেষী চরিত্রকে ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। এই ব্যর্থতাই বিজয়নগরের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ষষ্ঠত বিজয়নগরের সামরিক সংগঠনও যুগোপযোগী ছিল না। এই কারণেই তারা বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে পেরে ওঠে না। তার উপর, বিজয়নগরের সেনাবাহিনী ছিল জাতিভেদ প্রথার দ্বারা বিচ্ছিন্ন, সামন্ততান্ত্রিক এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ফলে বিরোধীদের সঙ্গে তাদের লড়াই করে জয়লাভ সহজসাধ্য ছিল না।

◆ প্রশ্ন ২৫. বাহমনী রাজ্যের সংহতিসাধনে সাহমুদ গাওয়ানের ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর : পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয় বাহমনী রাজ্য। এই সময়ই বাহমনী রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদেশি এবং ভারতীয় অভিজাতদের মধ্যে তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই সঙ্কটকালেই উত্থান হয় মামুদ গাওয়ানের।

গাওয়ানের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন একজন ইরানী। ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম লক্ষণীয় হয়ে ওঠেন। ওই সময় ক্ষমতাসীন নবাবের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয় তাকে প্রতিহত করার দায়িত্ব দেওয়া

হয় গাওয়ানকে। তিনি ক্রমশ নবাবের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দে নবাবের মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসান হয়। তখন যে পরামর্শদাতা পরিষদ গঠন করা হয় তার সদস্য করা হয় গাওয়ানকে। কিন্তু মালবের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে সেই পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন যুবরাজ সিংহাসনে বসলে তিনি গাওয়ানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন।

এরপর থেকে কুড়ি বৎসর ধরে গাওয়ান বাহমনী রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি পূর্বে ও পশ্চিমে রাজ্যকে প্রসারিত করতে উদ্যোগী হন। পূর্বে উড়িষ্যার সঙ্গে তিনি বিরোধে জড়িয়ে যান। তখন তিনি বিজয়নগরের সঙ্গে যুক্তভাবে উড়িষ্যার গজপতি শাসককে করমণ্ডল উপকূল থেকে বিতাড়িত করেন।

গাওয়ান বিশেষ সামরিক সাফল্য অর্জন করেন পশ্চিমে। তিনি ধাবল এবং গোয়া পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। এর ফলে বাহমনী রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারিত হবার সুযোগ পায়।

উত্তরে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাঁধে মালবের। দীর্ঘ যুদ্ধের পর স্থির হয় যে খেরিয়া অঞ্চল মালবের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং বেরার পাবে বাহমনী রাজ্য। কিন্তু সর্বদাই বেরারের উপর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল মালবের। তাই গাওয়ানকেও বেরার দখলে রাখার জন্য দীর্ঘ স্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। শেষপর্যন্ত গুজরাটের সাহায্যে তিনি সাফল্য লাভ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক সংগ্রামে ধর্ম নয়, প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বাণিজ্যিক স্বার্থ। দ্বিতীয়ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেনি। যেমন পশ্চিমে মালব এবং গুজরাট দাক্ষিণাত্যের বিরোধে জড়িয়ে যায়, তেমনি পূর্বে উড়িষ্যা বঙ্গদেশসহ করমণ্ডল উপকূলের সঙ্গে বিরোধে যুক্ত হয়।

গাওয়ানের নেতৃত্বে বাহমনী রাজ্যের সম্প্রসারণের ফলে বিজয়নগরের সঙ্গে বিরোধের পুনরায় সূচনা হয়। কিন্তু তখন বিজয়নগর ছিল এক ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। ফলে গাওয়ান অনায়াসে তুঙ্গাভদ্রা অঞ্চলে সুদূর দক্ষিণে কাঞ্চি পর্যন্ত পৌঁছে যান।

প্রশাসক হিসাবেও গাওয়ান অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। প্রথমে তিনি অভিজাতদের ক্ষমতা সংকুচিত করেন। তাই প্রদেশগুলিকে আরও উপভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক দুর্গের প্রধান সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। অভিজাতদের নগদে বেতন দেওয়া হত কিংবা জায়গীর দেওয়া হত। জমি জরিপ করে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের চেষ্টাও করা হয়।

Scanned with OKEN Scanner

প্রশ্ন ৩৪. শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

উত্তর : রাজ্য জয় অপেক্ষা রাজ্য শাসনেই শেরশাহ সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসে যে অমরত্ব তিনি অর্জন করেছেন তার মূলে রয়েছে শাসক হিসাবে তাঁর সাফল্য। ঐতিহাসিক কীন শাসক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানাতে গিয়ে লিখেছেন যে অন্য কোনো সরকার এমনকী ব্রিটিশ সরকারও এই পাঠান সুলতানের মতো দক্ষতা দেখাতে পারেননি। ঐতিহাসিক আসকীন বলেছেন, আকবরের পূর্ববর্তী যে কোনো সুলতানের তুলনায় শেরশাহ ছিলেন আইন প্রণয়নে এবং জলকল্যাণে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত। ডঃ কে কে কানুনগো মনে করেন, শেরশাহ ছিলেন আফগানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসক।

শাসক হিসাবে তিনি স্বৈরতন্ত্রী হলেও তাঁর স্বৈরতন্ত্র ছিল উদার। তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের অভিভাবক বলে মনে করতেন। এজন্যই ঐতিহাসিক কুক বলেছেন যে শেরশাহই হলেন প্রথম যিনি গণ সমর্থনের ভিত্তিতে তাঁর সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখেই তিনি তাঁর প্রশাসনিক নীতি স্থির করেন। সেই নীতি হল ধর্ম নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতিত্বহীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শাসনকার্যে তিনি কখনো তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেননি। তিনি জানতেন যে তাঁর অধিকাংশ প্রজাই হল অ-মুসলমান এবং অ-আফগান। সুতরাং বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে তিনি তাঁর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

কেন্দ্রীয় শাসন— শাসনের সর্বোচ্চে স্বভাবতই ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিল চারজন মন্ত্রী। যথাঃ অর্থবিভাগ পরিচালনার জন্য দেওয়ান-ই-উজিরৎ, সেনা বিভাগ পরিচালনার জন্য দেওয়ান-ই-আরজ, সরকারি নির্দেশাবলী রচনার জন্য দেওয়ান-ই-ইন্‌স এবং চতুর্থ জন্য হলেন দেওয়ান-ই-

রিশালৎ। তাছাড়া বিচার বিভাগের জন্য ছিল দেওয়ান-ই-কাজী এবং সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য দেওয়ান-ই-বারিদ।

প্রাদেশিক শাসন— শাসনের সুবিধার জন্য শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকার বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। সরকার পরিচালনা করতেন শিকদার-ই-শিকদার এবং মুনসিফ-ই-মুনসিফান নামে দুই কর্মচারী। প্রথম জন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আর দ্বিতীয় জন বিচার বিভাগের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রত্যেকটি সরকার আবার কতগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরগণার কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিকদার, আমিন এবং মুনসিফ। পরগনা শাসনের ক্ষেত্রে শেরশাহ হস্তক্ষেপ করতেন না। পরগনা গঠিত হত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে। গ্রামের শাসনভার স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল।

রাজস্ব সংস্কার— রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রেই শেরশাহের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। এ ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল একদিকে রাজস্বের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ এবং সেই রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করা, অন্যদিকে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা।

এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য অর্জনে শেরশাহ প্রথমে সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করেন। এরই ভিত্তিতে তিনি প্রজাদের পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে প্রজাগণ কবুলিয়ত বা এক অঙ্গীকার পত্রের মাধ্যমে সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে বাধ্য করত। জমি জরিপের সুবিধার জন্য তিনি সাম্রাজ্যব্যাপী এক অভিন্ন পরিমাপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে জমিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা অধিক ফসলী জমি, মাঝারি ফসলি জমি এবং কম ফসলি জমি। ভূমি রাজস্বের হার ছিল এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ। রাজস্ব নগদে বা শস্যে দেওয়া যেত।

ভূমি রাজস্ব বিভাগের প্রশাসনিক খরচ কৃষকদেরই বহন করতে হত। এজন্য তাদের অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালে কৃষকদের সাহায্য দেবার জন্য ফসলের ২.৫% অতিরিক্ত কর নেওয়া হত।

শেরশাহ ভূমি রাজস্বের নিয়মিত আদায়ের উপর গুরুত্ব দিতেন। এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়কারীদের কমিশন দেওয়া হত। কৃষকদের উপর যেন কোনো অন্যায় জুলুম না হয় সে বিষয়েও তিনি সতর্ক ছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা ছিল।

ভূমি রাজস্ব ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শেরশাহ শুল্ক ব্যবস্থার

সংস্কার করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত নানা অবৈধ শুল্ক তিনি বাতিল করেন। একমাত্র সীমান্ত এবং বিক্রয় কেন্দ্রেই শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারে শেরশাহ দাম নামে এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি প্রাচীন ও মিশ্রিত ধাতুর প্রচলন বন্ধ করেন। স্বর্ণমুদ্রাও তিনি প্রচলন করেন।

'বিচার ব্যবস্থা'— শেরশাহ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার প্রচলন করেন। বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি বিচারের ভার ছিল কাজী ও মীর-ই-বাদল নামে কর্মচারীর উপর পঞ্চায়েত হিন্দুদের দেওয়ানী মামলার বিচার করত। কিন্তু ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাধারণ বিচারালয়ে যেতে হত। এ সময় দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

'পুলিশি ব্যবস্থা'— শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেশে পুলিশি ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়। স্থানীয় অপরাধের জন্য স্থানীয় মুকাদ্দম দায়ী থাকতেন। পুলিশ বিভাগকে সাহায্য করার জন্য ছিল মহাতাসিব নামে একদল কর্মচারী।

'সামরিক সংস্কার'— সামরিক বিভাগে শেরশাহ সামন্ত প্রথা বাতিল করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন। নানা জাতির সংমিশ্রণে তিনি এক স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সেনাদের বেতন আংশিক নগদে, আংশিক জায়গির মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেনাবাহিনীর ছিল তিন ভাগ। যথা অশ্বারোহী, পদাতিক এবং গোলন্দাজ। বাহিনীর প্রধান এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ শেরশাহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকত। তিনি আলাউদ্দিন খিলজির দাগ ও হুলিয়া প্রথা অব্যাহত রাখেন। বাহিনীতে বদলির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপন করে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়।

'যোগাযোগ ব্যবস্থা'— যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য শেরশাহ অনেক দীর্ঘ এবং প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেন। যেমন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। পথিকের সুবিধার জন্য রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং সরাইখানা স্থাপিত হয়। ডাক চলাচলে গতি আনার জন্য তিনি ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে তাঁর ছিল এক দক্ষ গুপ্তচর বিভাগ।

প্রশ্ন ৩৫. সুলতানী যুগে শিল্পের অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর : সুলতানী যুগে নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল। যেমন বস্ত্র বয়ন শিল্প, ধাতু শিল্প, নির্মাণ শিল্প, খনি শিল্প, চর্ম শিল্প, কাগজ শিল্প, খেলনা শিল্প ইত্যাদি।

Scanned with OKEN Scanner

উত্তর : ১৫ নম্বরের ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

প্রশ্ন ৩০. সুলতানী যুগে প্রধান প্রধান কৃষিজাত পণ্য কী কী ছিল?

উত্তর : সুলতানী যুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। ভূমি রাজস্বই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। স্বভাবতই কৃষির উন্নয়ন এবং প্রসার ব্যতীত এমন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষায় সঙ্কট সৃষ্টি হতে পারত। তাই সুলতানী যুগে যেমন অনেক পরিত্যক্ত জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলা হয় তেমনি কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা হয়।

তখন কৃষি জমি ছিল যেমন উর্বর, তেমনি উৎপাদনও হত প্রচুর। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার অধিকাংশ জমি ছিল দুই বা তিন ফসলি। ইবনবতুতা বঙ্গদেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেছেন, পাঞ্জাব এবং গোয়ালিয়রে প্রচুর গম এবং ধান উৎপাদিত হত। খরিফ এবং রবি শস্যের উৎপাদনের জন্যও এই অঞ্চল ছিল বিখ্যাত। তখন উৎপাদন করা হত নানা ধরনের ফল। ইবনবতুতা আম, কাঁঠাল, কমলালেবু, নারকেল প্রভৃতি ফলের উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যগুলি হল বার্লি, মশলা, আলু, ইক্ষু, তামাক, তৈলবীজ, পান সুপারি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩১. সুলতানী যুগের শিল্পের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর : ১৫ নম্বরের ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

প্রশ্ন ৩২. ইকতা প্রথা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ইকতা প্রথা হল এক তুর্কী প্রথা যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি যথা : ১) যাকে ইকতা দেওয়া হত তাকে বলা হত মুকতি। তিনি তার এলাকার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ২) সূচনার মুকতির রাজস্ব আদায় করা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব ছিল না। ৩) কৃষক যদি রাজস্ব ঠিকমত জমা দেয় তা হলে তার উপর মুকতির কোনো কর্তৃত্ব থাকত না। ৪) জমি এবং কৃষকের উপর আইনগত অধিকার ছিল সুলতানের। এই আইন মুকতিদেরও মেনে চলতে হত। ৫) সুলতানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত মুকতির ইকতা ভোগের অধিকার। ইকতা শব্দটির অর্থ হল অংশ। অংশ বলতে বোঝায় সাম্রাজ্যের অংশ। মুসলমানেরা ভারতে আসার পর তারা ভারতে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রত্যক্ষ

Scanned with OKEN Scanner

সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন বোধ থেকেই তুর্কী শাসকগণ ভারতে ইকতা প্রথার প্রচলন করেন।

প্রশ্ন ৩৩. সুলতানী যুগের রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

উত্তর : সুলতানী যুগের সূচনায় তুর্কী শাসকগণ ভারতে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন করেনি। তখন তাদের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য হিন্দু জমিদারদের উপরই নির্ভর করতে হত। কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজির সময় থেকেই ব্যবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। তিনি দোয়াব অঞ্চল এবং রাজস্থান ও মালবের কিছু অংশে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন। এইসব অঞ্চলের জমিগুলিকে খালসায় পরিবর্তিত করেন। জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে প্রভাবিত হয় প্রচলিত গ্রামীণ ব্যবস্থা। কারণ তখন থেকেই জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস আরম্ভ হয়।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক রাজস্ব ব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেন। একটি হল, জমি জরিপের পরিবর্তে তিনি খালসা জমিও বন্টনের ব্যবস্থা করেন। অপরটি হল, তিনি ইকতাভুক্ত অঞ্চলগুলিতে রাজস্ব বৃদ্ধি করা একেবারে নিষিদ্ধ করেন। এই দুই ব্যবস্থাই ছিল কৃষকের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত।

মহম্মদ বিন তুঘলক আলাউদ্দিন প্রবর্তিত ব্যবস্থাই পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। ফলে সাম্রাজ্যব্যাপী দেখা দেয় কৃষক বিদ্রোহ। অবশ্য মহম্মদের লক্ষ্য ছিল সম্পদশালী জমিদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ। কিন্তু তাঁর এই ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ কৃষকেরাই। অথচ মহম্মদ কৃষির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন যুগান্তকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। ফিরোজের সময় জলসেচ ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রসার ঘটে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে সুলতানী যুগে ভূমি রাজস্বের হার ছিল যথেষ্ট বেশি। সেই সঙ্গে লক্ষ্য ছিল মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সংকুচিত করার চেষ্টা। তবে গ্রামীণ জীবনে অসাম্য অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

প্রশ্ন ৩৪. শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ...

Scanned with OKEN Scanner

উত্তর : ১৫ নম্বরের ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

প্রশ্ন ২৮. ফিরোজ তুঘলকের সময়ে ক্রীতদাস প্রথা সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতটা দায়ী ছিল?

উত্তর : দিল্লির সুলতানেরা মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত প্রথা অনুসারে যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাসে পরিণত করতেন। সাধারণত অধিকাংশ যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করা হত। কিছু বাছাই বন্দিদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন ফিরোজ তুঘলক। তিনি অধিক সংখ্যায় ক্রীতদাস সংগ্রহের নির্দেশ দেন। তাঁর ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ১,৮০,০০০। তাদের কাউকে ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। কাউকে কারিগর হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এমনকী ক্রীতদাসদের নিয়ে এক রক্ষীবাহিনীও গড়ে তোলা হয়। এই পদক্ষেপ ছিল সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ ফিরোজের মৃত্যুর পর এই রক্ষীবাহিনী সুলতান নির্বাচনের রাজনীতিতে জড়িয়ে যায়। ফলে তা সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে সংকটের সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ২৯. ফিরোজ তুঘলক সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতটা দায়ী ছিলেন?

উত্তর : ১৫ নম্বরের ১৮নং প্রশ্নের উত্তরের তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখ।

প্রশ্ন ৩০. দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে খলিফার সম্পর্ক কী ছিল?

উত্তর : দিল্লির সুলতানেরা স্বাধীন হলেও তারা নিজেদের বৃহত্তর ইসলামীয় জগতের অংশীদার বলেই মনে করতেন। এই কারণেই ইলতুৎমিস খলিফার স্বীকৃতি অর্জনে আগ্রহী ছিলেন। কারণ এই স্বীকৃতি সাধারণ মুসলমানদের চোখে সুলতানদের গ্রহণযোগ্য করে তুলত, সেই সঙ্গে ইসলামীয় জগতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ হত। এমনকী চেঙ্গিস খাঁ বাগদাদে খলিফা প্রথার অবসান ঘটালেও দিল্লির সুলতানগণ খলিফার প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ন রাখেন। মহম্মদ বিন তুঘলক এই মানসিকতার বিপক্ষে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তবে ফিরোজ তুঘলকের পর থেকে খলিফার স্বীকৃতি লাভের প্রয়াসের অবসান ঘটে।

Scanned with OKEN Scanner

তুঘলকের রাজত্বের বিশৃঙ্খলার সুযোগে বিজয়নগর রাজ্যের সূচনা হয়। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গম নামে এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্রের মধ্যে হরিহর এবং বুক্কা নামে দুই পুত্রের চেষ্টায় বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাধব বিদ্যারণ্য এবং তাঁর ভ্রাতা পণ্ডিত সায়নাচার্য, যিনি বেদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন।

➧ প্রশ্ন ৩৫. দ্বিতীয় হরিহরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর : বিজয়নগরের সঙ্গম বংশীয় রাজা দ্বিতীয় হরিহর ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি কানাড়া, মহীশূর, ত্রিচিনপল্লী এবং কাঞ্চি জয় করেন। তাঁকে বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু তার আগে দুই দশক ধরে দ্বিতীয় হরিহরের নেতৃত্বে বিজয়নগর যথেষ্ট শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। তাঁর রাজ্যের পূর্ব এবং দক্ষিণ ছিল সমুদ্রবেষ্টিত। ফলে তখন বিজয়নগরের বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। তিনি নিজে শৈব হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ছিলেন সহনশীল।

➧ প্রশ্ন ৩৬. বাহমনী রাজ্যের উৎপত্তি হয় কীভাবে?

উত্তর : মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দাক্ষিণাত্যের অভিজাতগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহম্মদ নিজে এসে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং কয়েকজন বিদ্রোহী নেতাকে ব্রোচে যাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু এইসব নেতারা সুলতানের আদেশ অমান্য করে দৌলতাবাদ দখল করে এবং ইসমাইল নামে তাদের এক নেতাকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ইসমাইল এই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন এবং হাসান নামে অপর এক অভিজাতের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এই হাসান আলাউদ্দিন বাহমন শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং সেই সঙ্গে জন্ম হয় বাহমনী রাজ্যের।

চিন্তিবাদীগণ যেখানে রাজশক্তি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন ... সেখানে রাজানুগ্রহ গ্রহণে দ্বিধা করতেন না।

প্রশ্ন ৪৪. কবিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর : ভক্তিবাদী কবির ছিলেন তন্তুবায় শ্রেণির। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। পূজা, উপাসনা ইত্যাদি ত্যাগ করে তিনি ভক্তিবাদকেই গ্রহণ করেন। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। তাই ঈশ্বর ও আল্লার মধ্যে তিনি পার্থক্য করতেন না। জাতিভেদ প্রথা, মূর্তিপূজা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতিকে তিনি ঘৃণা করতেন। কবির তাঁর বাণীগুলিকে গীতিকবিতা বা দোহারের আকারে প্রকাশ করতেন। আর এইসব দোহারের জনপ্রিয়তা এখনও এতটুকুও ম্লান হয়নি।

প্রশ্ন ৪৫. জিয়াউদ্দিন বারণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর : সুলতানী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন জিয়াউদ্দিন বারাণী। তাঁর রচিত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে বলবনের সময় থেকে ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালের প্রথম আট বৎসর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব হল যে এখানে সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তবে বারাণী ধর্মান্ধ ছিলেন। তাই তিনি নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসকে বিচার করতে পারেননি। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ ছিল ফতোয়া-ই-জাহান্দারি। এটি ছিল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ইতিহাস।

প্রশ্ন ৪৬. ইবনবতুতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর : ইবনবতুতা ছিলেন একজন মরক্কো দেশীয় পর্যটক। তিনি ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি প্রধান কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত কিতাব-উর-রেহলা গ্রন্থে সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সুলতান সম্পর্কে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি আরবীয় ভাষার একজন পণ্ডিত ছিলেন। ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। ফলে অনেক জায়গাতেই তাঁর দেওয়া তথ্যে বিভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক।

Scanned with OKEN Scanner

উদ্যোগেই ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মেকলের নেতৃত্বে নিযুক্ত হয় আইন কমিশন।

তবে উদারবাদীদের সঙ্গে উপযোগিতাবাদীদের কতগুলি পার্থক্য ছিল। যেমন ভারতীয়দের শিক্ষা প্রসঙ্গে উদারবাদী মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে জোরাল মত প্রকাশ করেন। কিন্তু উপযোগিতাবাদীরা দেশীয় শিক্ষার উপরই অধিকতর গুরুত্বদানের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে নীতি নির্ধারণে ছিল এক ধরনের দোদুল্যমানতা যার মূর্ত প্রতীক ছিলেন লর্ড বেন্টিংক। উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী বেন্টিংক আইনের পথেই এদেশে পরিবর্তনের কথা বলেন। আইনের সাহায্যেই তিনি ভারতে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। আবার ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হন। তাঁরই সময়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংকলিত হয়।

প্রশ্ন ৩. উপযোগিতাবাদ এবং ধর্মাশ্রিত মানবতাবাদ বলতে কী বোঝ? এই দুই মতবাদ ভারতে কীভাবে প্রয়োগ করা হয়?

উত্তর : ১৫ নম্বরের ২নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

প্রশ্ন ৪. পলাশীর যুদ্ধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের সূচনা হয় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ থেকে। যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন।

ভারতে তখন সবচেয়ে উর্বর এবং সম্পদশালী প্রদেশ ছিল বঙ্গদেশ, শিল্প-বাণিজ্যেও ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তার কর্মচারীদের বিশেষ আগ্রহ ছিল এই প্রদেশ সম্পর্কে। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাটের এক ফরমান দ্বারা কোম্পানি বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে। কোম্পানির পণ্য চলাচলের জন্য দস্তক বা অনুমতি পত্র দানের অধিকারও দেওয়া হয়। কোম্পানির কর্মচারীদেরও ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তারা কোম্পানিকে দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগের অধিকারী ছিল না। তা সত্ত্বেও দস্তকের অপব্যবহারকে কেন্দ্র করেই বাংলার নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের সূচনা হয়। কারণ কর্মচারীগণও যখন কোম্পানির সুবিধাগুলি তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় গ্রহণ করতে থাকে তখন বাংলার নবাবদের বিপুল রাজস্ব ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। প্রথম দিকের নবাবেরা ইংরেজদের এই ক্ষতি পূরণ করে দিতে বাধ্য করেছিলেন। কোম্পানি নবাবের দাবি স্বীকার করে নিলেও কর্মচারীগণ অবাধেই দস্তকের অপব্যবহার করে যেতে থাকে।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে যখন ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজ-উদ-দৌল্লা বাংলার

নবাব হন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে প্রচলিত শর্তেই ইংরেজদের ব্যবসা করার নির্দেশ দেন। ইংরেজরা সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। তারা এই সাহস পেয়েছিল, কারণ ততদিনে ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা সম্পর্কে তারা সজাগ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা উল্টে কলকাতায় ভারতীয় পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক আদায় করতে থাকে। কারণ কলকাতা তখন ছিল কোম্পানিরই নিয়ন্ত্রণে। ফলে সিরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে তাঁর সন্দেহ হয় যে ইংরেজরা তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি হয় যখন কোম্পানি কলকাতাকে সুরক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়। তখন ফরাসীদের কুঠি ছিল চন্দননগরে। তারাও ইংরেজদের অনুসরণে চন্দননগরের সুরক্ষায় সচেষ্ট হয়। এই ঘটনা প্রবাহে স্বভাবতই বিচলিত হয়ে ওঠেন সিরাজ। তাঁর আশঙ্কা হয় যে দাক্ষিণাত্যের মতো বঙ্গদেশেও ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের এক পটভূমি তৈরি হচ্ছে। তাই তিনি উভয়পক্ষকেই তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মেনে নেয় ফরাসীরা, কিন্তু ইংরেজরা অগ্রাহ্য করে। বরং তারা বঙ্গদেশে বাধামুক্ত বাণিজ্যিক অধিকার দাবি করে। সিরাজ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে সকল বিদেশিকেই প্রচলিত আইন মেনে চলতে বাধ্য করা হবে।

সেই অনুসারে যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই সিরাজ ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে নেন এবং কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়ে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন ফোর্ট উইলিয়ম দখল করে নেন। এই অনায়াস সাফল্যে উল্লসিত সিরাজ কলকাতা ত্যাগ করেন। আর সেই সুযোগে ইংরেজরা ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। কারণ ফলতা ছিল তাদের নৌশক্তি দ্বারা সুরক্ষিত।

ফলতায় গিয়ে তারা মাদ্রাজ থেকে সাহায্য আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সেই সঙ্গে তারা নবাবের রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এইসব ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর এবং কলকাতার অধিকর্তা মানিক চাঁদ। তখনকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, বিখ্যাত মহাজন জগৎশেঠ এবং নবাবের অন্যতম সেনাপতি খাদিম খাঁও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। এই সময়ই মাদ্রাজ থেকে শক্তিশালী নৌ এবং সামরিক শক্তি নিয়ে বঙ্গদেশে আসেন এ্যডমিরাল ওয়াটসন এবং কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ। ১৭৫৭ সালের সূচনাতেই ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন এবং সিরাজকে ইংরেজদের সকল দাবি মেনে নিতে বাধ্য করেন।

Scanned with OKEN Scanner

কিন্তু এতেও ইংরেজরা সন্তুষ্ট হল না। কারণ তখন তাদের উচ্চাশা গগনচুম্বী। তারা সিরাজের জায়গায় তাদের হাতের এক পুতুলকে নবাবের পদে বসাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এইভাবে ষড়যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচিত হবার পরই ইংরেজরা সিরাজের কাছে কতগুলি অসম্ভব দাবিপত্র পেশ করে। স্বভাবতই সিরাজের দিক থেকে এইসব দাবি মেনে নেবার কোনো প্রশ্নই ছিল না। সুতরাং উভয়পক্ষ সম্মুখ সমরে নিজেদের শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হল। সেই পরীক্ষাই হল পলাশীর যুদ্ধ।

◆ প্রশ্ন ৫. মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের পটভূমি আলোচনা

Scanned with OKEN Scanner

এরপর ৮নং প্রশ্নের উত্তর যুক্ত কর।

প্রশ্ন ১১. রায়তওয়ারি প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? এই ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজের উপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল?

উত্তর : দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। এ অঞ্চলে বাংলা বা বিহারের মত বড় বড় জমিদার না থাকায় জমিদারি ব্যবস্থা চালু করার সুযোগ বিশেষ ছিল না।

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর ইংরেজরা টিপু সুলতানের রাজ্যের অনেকটাই অধিকার করে নেয়। অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'বড় মহল'। এই অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের এক বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বড় মহলের প্রধান প্রত্যেক রায়তর কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে একত্রে সরকারের কাছে জমা দিত। এই ব্যবস্থায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন তদানীন্তন ইংরেজ প্রশাসক আলেকজান্ডার রীড এবং টমাস মনরো। পরবর্তীকালে তারা যে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তা ছিল প্রচলিত ব্যবস্থারই এক উন্নত সংস্করণ। এই ব্যবস্থায় রায়তদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দানের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হত। এই ব্যবস্থাকেই বলা হয় রায়তওয়ারি ব্যবস্থা। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই ব্যবস্থা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

এই ব্যবস্থায় সরকার রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করত। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রায়তগণও নির্দিষ্ট রাজস্ব দানের বিনিময়ে জমির উপর সম্পূর্ণ মালিকানা ভোগ করত। সাধারণত কুড়ি বা ত্রিশ বৎসরের জন্য এই ব্যবস্থা চালু থাকত। তারপর রাজস্বের পরিমাণ নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা করা হত। সাধারণভাবে মোট উৎপাদনের অর্ধেক সরকারি রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা হত।

Scanned with OKEN Scanner

কিন্তু জমির উপর রায়তদের মালিকানার অধিকার তিনভাবে ক্ষুণ্ণ হত। প্রথমতঃ রাজস্বের হার ছিল খুব বেশি। ফলে রাজস্ব দেবার পর রায়তদের হাতে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকত না। দ্বিতীয়তঃ সরকার যে কোনো সময় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করত পারত। তৃতীয়তঃ খরা বা বন্যা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলেও রাজস্ব মকুব করা হত না।

জমি জরিপ করা এবং উৎপাদনের ভিত্তিতে জমির শ্রেণিবিন্যাস করা ছিল রায়তওয়ারি প্রথার প্রধান অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথমেই অতিরিক্ত রাজস্ব নির্ধারণ করায় সাধারণ মানুষ কৃষিকাজে আগ্রহবোধ করত না। মনরো মনে করেন, এটাই ছিল মানুষের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। এ কারণেই কৃষি-উৎপাদনও ছিল খুব কম। ফলে গ্রামীণ জীবনে দারিদ্র্য ছিল সীমাহীন।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থার সূচনায় সরকারের যে লক্ষ্য ছিল তা কিন্তু অর্জিত হয়নি। আসলে এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া এবং রায়তদের অবস্থার উন্নতি করা। এর মধ্যে প্রথমটি অর্জিত হলেও দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত রাজস্বের দাবিতে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। রায়তদের কোনো সঞ্চয়ই থাকত না। বরং তাদের অনেককেই ঋণভারে জর্জরিত হতে হয়।

দক্ষিণ ভারতে সামাজিক বিন্যাসের ভিত্তিই ছিল কৃষি ব্যবস্থা। কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ জীবনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে যায়। এতকাল প্রচলিত ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের জন্য এক শ্রেণির ব্যক্তি নিয়োগ করা হত। তাই সমাজ জীবনে এই শ্রেণির যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থা এই শ্রেণির বিলুপ্তি ঘটে। ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাতেই গ্রামীণ জীবনে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। তাই পরবর্তীকালে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই বিপর্যয়কে প্রতিহত করবার চেষ্টা করা হয়। স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে রায়তগণ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে। লক্ষণীয় হল সরকার কখনোই রায়তদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত না। এ কারণেও ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে রায়তগণ সন্তোষ প্রকাশ করে। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল তাকেও স্বীকার করে নিয়েছিল রায়তওয়ারি প্রথা। ফলে উচ্চবর্ণের লোকদের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা অব্যাহতই ছিল।

সমাজ জীবনে অবশ্য রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রচলিত জীবনধারায় কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পরোক্ষভাবে আঞ্চলিক ভাষা

প্রসারের সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় ভূমিদাসদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। আসলে রায়তদের ভূমিদাস রাখার মতো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। তারা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করত। ফলে ধীরে ধীরে ভূমিদাস প্রথা লুপ্ত হয়ে যায়। রায়তরা প্রয়োজন হলে অস্থায়ী মজুর নিয়োগ করত। তবে এই সব পরিবর্তন এসেছিল দীর্ঘকাল ধরে মন্থর গতিতে।

অন্যদিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে রায়তদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্য কোনো ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় এই সুযোগ ছিল না। পরবর্তীকালে নানা সংশোধনের মাধ্যমে যখন রায়তওয়ারি ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা হয় তখন এই ব্যবস্থা সরকারের পক্ষে যেমন লাভজনক হয়ে ওঠে তেমনি সাধারণ মানুষও গ্রহণযোগ্য বলে ভাবতে থাকে। এ কারণেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সি সহ ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

প্রশ্ন ১২. টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক আলোচনা কর। টিপু কী যথার্থই জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন?

উত্তর : দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালে হায়দর আলীর মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র টিপু সুলতান। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে টিপু অসম সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ম্যাঙ্গালোর পুনরুদ্ধার করেন এবং ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুসকে বন্দি করেন।

কিন্তু এর মধ্যে উভয় পক্ষই দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতেও দেখা দেয় চরম অর্থ সঙ্কট। বাধ্য হয়ে মাদ্রাজের গভর্নর টিপুর সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সন্ধি ম্যাঙ্গালোর সন্ধি নামে পরিচিত। কিন্তু ইঙ্গ-মহীশূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমীমাংসিতই থেকে যায়।

ইংরেজরা প্রতিটি যুদ্ধ বিরতি কালকে মূল প্রশ্ন মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের পুরায় সজ্জিত করে তোলার অবকাশ বলে মনে করত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালও ছিল সেই সময়। তবে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের পিটের ভারত শাসন আইন। এই আইনে কেবল আত্মরক্ষা ছাড়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে কোম্পানি যুদ্ধ যাত্রা করবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তাই এই আইন অগ্রাহ্য করে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্ভব ছিল না।

তা হলেও প্রস্তুতি চলতেই থাকল। নিজাম ও মারাঠাদের টিপু বিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস এক ত্রি-শক্তি জোট

Scanned with OKEN Scanner

উত্তর : ১০ নম্বরের ৬নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

প্রশ্ন ৭. শিখ ইতিহাসে অমৃতসরের সন্ধির গুরুত্ব কী?

উত্তর : পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের শাসনকালে ইংরেজদের সঙ্গে রণজিতের অমৃতসরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে শতদ্রু নদীর পূর্বে রণজিতের রাজ্য বিস্তারের আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই নদীকেই তাঁর রাজ্যের সীমানা মেনে নেওয়ায় তাঁর আর্থিক ক্ষতি হল। সবচেয়ে বড় কথা হল, রণজিৎ এই চুক্তির স্বাক্ষর করে ইংরেজদের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললেন। ফলে ভবিষ্যতে বিপদের সূচনা হল। কারণ রণজিতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর ইংরেজদের প্রভাব এই সন্ধির ফলে বৃদ্ধি পেল।

প্রশ্ন ৮. লাহোর সন্ধির (১৮৪৬) প্রধান বিষয়গুলি কী ছিল?

উত্তর : লাহোরে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রধান শর্তাবলীর ফল হলঃ- ১) মহারাজা এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ শতদ্রু নদীর দক্ষিণ দিকের অঞ্চলের উপর সকল দাবি এবং অধিকার প্রত্যাহার করে নেন। ২) বিয়াস এবং শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী সকল অঞ্চলের উপর সকল অধিকার প্রত্যাহার করে নেন মহারাজা। ৩) কোম্পানি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেড় কোটি দাবি করে। এই দাবি মেটানোর ক্ষমতা ছিল না মহারাজার। তাই তিনি বিয়াস এবং সিন্ধু নদের মধ্যবর্তী অঞ্চল সেই সঙ্গে কাশ্মীর ও হাজারা ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেন। ৪) মহারাজা বিদ্রোহী সৈন্যদের বিতাড়িত করতেও সম্মত হন। ৫) ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনও বিদেশিকে নিয়োগ করা হবে না বলে মহারাজা অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। ৬) নাবালক দলীপ সিংহকে পরবর্তী মহারাজা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ৭) পাঞ্জাবের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

Scanned with OKEN Scanner

প্রশ্ন ৪. অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা কী কাল্পনিক?

উত্তর : সিরাজ-উদ-দৌল্লা ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন ফোর্ট উইলিয়ম দখলের পর নারী ও শিশুসহ ইংরেজ বন্দিদের দুর্গের একটি ঘরে আটক করে রাখেন। বলা হয় বন্দির সংখ্যা ছিল ১৪৬। ঘরের আয়তন ছিল ১৮ ফুট x ১৪ ফুট x ১০ ইঞ্চি। ২০শে জুন পর্যন্ত বন্দিদের এই ঘরে আটক রাখা হয়। পরদিন ঘরের দরোজা খোলা হলে দেখা যায় মাত্র ২৩ জন বন্দি জীবিত আছে। বন্দিদের মধ্যে একজন জীবিত বন্দি হলওয়েল এই ঘটনাকেই অন্ধকূপ হত্যা বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু সম্ভবত বন্দিদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। তাছাড়া সিরাজের এক কর্মচারী বন্দিদের যে ঘরে আটক রাখেন সেটি জেল খানা হিসাবেই ব্যবহৃত হত। এই ঘটনার সঙ্গে সিরাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবে সিরাজের ভুল হল এই ঘটনার জন্য দায়ী কর্মচারীকে তিনি কোনো শাস্তি দেননি। কিংবা জীবিত বন্দিদের প্রতিও তিনি কোনো করুণা প্রকাশ করেননি। ঘটনাটি এত সাধারণ ছিল যে সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিকের রচনায় তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কিন্তু কোম্পানি এই ঘটনাকেই অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই প্রচারের মাধ্যমে সিরাজ-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা।

Scanned with OKEN Scanner